হাতপাখার নকশা উপকরণ, করণকৌশল ও আঞ্চলিক ভিন্নতা

মোসাঃ তাসলিমা বেগম*

সারসংক্ষেপ : *হাতপাখা বাংলাদেশে আবহমানকাল থেকে সাধারণ মানুষের খুব প্রয়োজনীয় ও দৈনন্দিন ব্যবহৃত পণ্য। প্রাচীনকাল থেকে হাতপাখা তৈরি করছে গ্রামের সাধারণ মানুষ। কখনো কখনো এই হাতপাখা নকশা ও করণকৌশলের কারণে শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে লোকশিল্পের সব গুণ ও শর্ত অনুসারে এই নকশি হাতপাখা একটি লোকশিল্প। এই লোকশিল্পের নকশা জ্যামিতিক, বিন্যাস বিমূর্ত শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। হাতপাখা নকশা বিভিন্ন পোস্টার ডিজাইন বিশেষ করে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে তৈরি ব্যানার ফেস্টুনে ব্যবহৃত হয়। হাতপাখার নকশা, উপকরণ, করণকৌশলে রয়েছে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা। এই প্রবন্ধে নকশি পাখার এই বিভিন্নতা, মটিফ, নকশা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া পাখার বিপণন, পাখা তৈরি ও নান্দনিকতা পাখা শিল্পীদের উন্নতিকরণের প্রস্তাবনা রয়েছে।*

কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের নিজস্ব সৃজনশীল কর্মকৌশল ও ঐতিহ্য লোকশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঐ জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, পারস্পরিক যোগাযোগ, বস্তুকেন্দ্রিক সৃষ্টি ও তার প্রক্রিয়া লোকশিল্পের অংশ, লোকাচার সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে জন লিল্যান্ড (১৫০৩-৫২), উইলিয়াম ক্যামডেন (১৫৫১-১৬২৩), জন অবেরি (১৬২৬-৯৭) প্রমুখ ব্যক্তি একটি ধারা শুরু করেছিলেন। ষোল শতকের পরবর্তীসময়ে বিভিন্ন জাতি তাদের লোকাচার বিদ্যার করণকৌশল ও উপাদান নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কথা বলেছেন (তারিকুল আহসান, ২০২০ : ১২)। বাংলার এই অঞ্চলের লোকাচারকে যারা পরিচিত করেছেন তাদের মধ্যে গুরুসদয় দত্ত অন্যতম। তিনি বলেছেন, "চিত্রকলার ও বর্ণবিন্যাসের প্রতিষ্ঠা বাংলার পল্লির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর মধ্যে এখনো যে

*খণ্ডকালীন শিক্ষক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রকম ব্যাপকভাবে বর্তমান আছে, এবং শুধু ব্যাপকভাবে বর্তমান নয়, এই প্রতিষ্ঠা এত উচ্চস্তরের যে, এরকম বোধ হয় আজকাল এই পণ্যতন্ত্রের দিনে খুম কম দেশেই আছে।" আর লোক শিল্পকলা এমন এক ধরনের শিল্পকলা যা আনুষ্ঠানিক বা একাডেমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পকলা থেকে সব সময় আলাদা। সাবেকি কায়দায় সৃষ্ট কোনো শিল্পকর্ম বা অলংকরণ যা সৃষ্টি হয়েছে অনাগত কাল থেকে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে। এছাড়া জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি লগ্নের প্রয়োজনে এই শিল্পের জন্ম (রফিকুল আলম, ২০১৫ : ১৪৫)।

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই নিজ হাতে দেবমূর্তি কাঠের বা পাথরের কিংবা মাটির, মৃৎপাত্র ও চিত্রিত মৃৎফলক, দেওয়াল চিত্র, আলপনা, পুতুল, মুখোশ, বয়নশিল্প ও অলংকারশিল্প ইত্যাদি তৈরি করেছে। এগুলো পৃথিবীর সর্বত্রই কম-বেশি লোকশিল্পীদের দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। চরিত্র লক্ষণে এসব শিল্পের মধ্যে একটি বিশ্বস্ত সামঞ্জস্য দেখা গেলেও নিতান্ত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে। লোকশিল্প গড়ে উঠে উন্নত কৃষিজীবী মানুষের মাঝে। এরা লাঙলের সাহায্যে জমি চাষ করে ফসল ফলায় শহরের মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে। এই কৃষিজীবী শ্রেণি তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করে বিলাসী শিল্পদ্রব্য যা লোকশিল্পের উপায়। এসব বিলাসী পণ্য নিজেদের জন্য তৈরি করলেও তা শিল্পমানসম্পন্ন হয়ে শহরেও পৌঁছে যায়।

Folk Art-এর বাংলা প্রতিশব্দ "লোক শিল্প"। লোকশিল্পের নৃতাত্ত্বিক দর্শন হলো প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে সৌন্দর্য বোধের অনুভূতির, যার রূপায়ণ বস্তু সংস্কৃতিতে। তাই বলা যায়, আবহমান বাংলার লোকসমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে যে চারু-কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে তাই লোকশিল্প (গোলাম সামাদ, ২০০৬ : ১৬৯)।

লোকশিল্পীরা নিজেদের শিল্পী হিসেবে দাবি করে না। এরা কাজ শিখে বংশপরম্পরায়। এ শিল্পকলা বিশেষভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট লোকশিল্পী বা কারিগররা সবকিছুর রূপকেই সরল করে তুলেন। গ্রামকেন্দ্রিক বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষি, কারুশিল্প, লোকাচার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় রূপান্তর এবং ক্রমবিকশিত হয়ে চলেছে।

বর্তমান বাংলাদেশের এ অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কখনো তীব্রশীত আবার কখনো প্রচণ্ড তাপদাহ কিংবা বৈরী ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজমান। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হওয়ায় মানুষ স্বস্তির বাতাস পাওয়ার উপায় উপকরণ খুঁজে ফেরে। যান্ত্রিক তথা বৈদ্যুতিক সুবিধা যখন ছিল না মানুষ গরমের তাপদাহ ও শীত নিবারণের জন্য ছাতা, কাঁথা ও হাতপাখার ব্যবহার শুরু করেছিল। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে গরমের আরাম খুঁজতে নানারকম কৌশল উদ্ভাবিত হলেও বাংলার লোকশিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হাতপাখার আবেদন হারিয়ে যায়নি। এখনো এর ব্যবহার বিপণন হচ্ছে গ্রামে-গঞ্জে।

ঠিক কোনো সময়ে হাতপাখার প্রচলন হয়েছিল তা জানা না গেলেও মানুষ নিজের প্রয়োজনে খুব প্রাচীন কালেই এর ব্যবহার করত। যান্ত্রিক পাখা ১৮৬০ সালে আমেরিকায় শুরু হওয়ার আগে হাতপাখার উপরই নির্ভরশীল ছিল মানুষ। অতি গরমে বাতাসকে চলমান করে গরম হাওয়া সরিয়ে অপেক্ষাকৃত শীতল হাওয়ার প্রবাহের জন্য হাতপাখার ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীকালে রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় এই পাখা একটি আলংকারিক শিল্পে রূপলাভ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে প্রথমে এক হাতে সঞ্চালন করে বাতাস করা হতো, তারপর একটি বড় পাতার ব্যবহার হতো এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবহার উপযোগিতার সাথে শোভাবর্ধন করতে পাখায় নকশা ও অলংকরণ যুক্ত হয়।

সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত নানাভাবে পাখার ব্যবহার চলছে। উষ্ণ আবহাওয়ায় সর্বজনীনভাবে পাখা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবে আজও ধর্মীয় ও রাজকীয় অনুষ্ঠানাদিতে অলংকৃত হাতপাখার ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। পাখার উদ্ভাবন সম্পর্কে নিউজার্সির "ওয়েল ফ্লিটবুক" (ISBN-155521-546-7) প্রকাশনার ১৯৯০ সালে "এ কালেকটর'স গাইড টুফেন"-এর আর্টিকেল দা অরজিন অফ দা ফ্যান" এ উল্লেখ আছে (FANS ARE AS OLD AS HOT WEATHER IT IS IMPOSSIBLE TO PIN POINT WHERE AND WHEN THE FAN ORIGINATED. IN HOT CLIMATING IT MUST ALWAYS HAVE BEEN INVALUABLE-IN CREATING A BREEZE AND KEEPING FILES AWAY. AFTER ALL THE EARLIEST KNOWN MAN COMES FROM NEAR THE EQUATOR. LETER IT BECAME A WORK OF ART AND WAS USED IN RELIGIOUS AND ROYAL CEREMONIES. LATER STILL IT BECOMES THE DECORATIVE ACCESSORY THAT WE KNOW TO DAY.) হাতপাখার প্রাচীনত্ব এবং

এর সংজ্ঞা সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ভলিয়ুম-৪-এ উল্লেখ রয়েছে যে, FAN: HAND BHELD COOLIN DEVICE FOR PRODUCTINFG A CURRENT OF AIR THAT HAS BEEN USED THROUGHOUT THE WORLD SICNE ANCIENT TIME" এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় পাখার দুটি বিভাগ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। "এর মধ্যে প্রথমটি বাংলাদেশের হাত পাখার মতো ফ্ল্যাট সারফেসের উপর নকশাকৃত এবং লম্বা হাতল যুক্ত চারদিক মাউন্ড করা। অন্যটি ফোল্ডিং পাখা অনেকগুলো শলা কিংবা কাঠিতে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। সুতা, তার, কিংবা আঠার সাহায্যে একটি অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত দিয়ে আটকানো হয়, এই ধরনের পাখা তৈরির ক্ষেত্রে চীন ও জাপান উৎকর্ষতা দেখিয়ে আসছে।" (রবীন্দ্র গোপ, ২০১৪ : ২৩১, ২৩২)

যদিও নকশি পাখায় ব্যবহৃত মোটিফ নকশিকাঁথা বা আলপনার মতোই উন্নত ও নকশা-নির্ভর। তবু সৃজনশীলতায় ও নান্দনিকতায় তা বিশেষ মর্যাদা পেতে পারে। পাখা নিয়ে চমৎকার ছড়া প্রচলিত আছে, বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত দুটি ছড়া উদ্ধৃত করা হলো–তালগাছ জন্ম তোমার/নামটি তোমার পাখা/শীতকালে শত্রু তুমি/গ্রীষ্মকালে সখা'। আরেকটি ছড়ায় বলা হচ্ছে–'শীতে তুমি লুকিয়ে থাকো/ গরমে দাও দেখা/আদর করে নাম রেখেছি/তাই তো তোমায় পাখা'। (শাওন আকন্দ, ২০১৩ : ১৪৭)

বাংলাদেশের হাতপাখা সম্পর্কে জনাব তোফায়েল আহম্মদ বাংলা একাডেমির ভাষা শহীদ গ্রন্থমালার লোকশিল্প গ্রন্থে নকশি পাখা তথা হাতপাখা সম্পর্কে বলেছেন যে, "উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত এদেশে খর বৈশাখের দাবদাহে এবং ভাদ্রের আর্দ্রতা মিশ্রিত গরমে হাত পাখা মানুষের নিত্য সাথী। মেয়েদের হাতে তৈরি পাখার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কবি বিষ্ণু পালের "বেহুলা লখীন্দর" পালায় বেহুলা মরা স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার পর ডোমনী নারীর ছদ্মবেশে পাখা বেচতে চাঁদ সওদাগরের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিলেন বলে কথিত আছে। এইসব পাখার নানান নকশার বেহুলা লখিন্দর আর মনসার ছবি চিত্রিত থাকত। এছাড়া প্রাচীন লোকগাথাও চিত্রিত পাখা নিয়ে বহু উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সে কালের মেয়েরা ছেঁড়া ন্যাকড়া, বাঁশের কঞ্চি, কাশফুলের ডাঁটা চিরে চিরে নানা ধরনের পাখা তৈরি করতেন। বীরভূমের গোবিন্দপুর গ্রামের এক বৃদ্ধার মুখে শোনা যায়–অল্প বয়সে এঁরা নানা ধরনের পাখা তৈরি করতেন। আর নামকরণ করা হতো মজার মজার যেমন

গঙ্গাগোবিন্দ পাখা, মনমোহিনী পাখা ইত্যাদি। সেকালে একটি মেয়ে অন্য একটি মেয়েকে মনমিষ্টি নামের পাখা তৈরির কৌশল শিখিয়ে মনমিষ্টি সই পাতাত। ছেঁড়া শাড়ির পাড়, ছেঁড়া সুতো দিয়ে পাখার গায়ে কত নকশা আঁকা হতো তার হিসাব নেই (দুলাল চৌধুরী, পল্লব সেন গুপ্ত, ২০১৩ : ৩৯৫)। পাখা তৈরি করতে আলাদা পাখার ভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন হয়। অঞ্চলভেদে পাখার উপকরণে বিভিন্নতা দেখা যায় হাতপাখা কোথাও বিছুইন ও পাংখা নামেও বিভিন্ন স্থানে পরিচিত। নকশি পাখার আকার সাধারণত গোলাকার আকৃতির হলেও অর্ধবৃত্তাকার, ভাঁজ করা বা ফোল্ডিং, চৌকোনাকার পানপাতাসহ, নানা রকমের হয়ে থাকে। জ্যামিতিক, ফুল, লতাপাতাসহ বিচিত্র নকশা পাখায় ফুটিয়ে তুলেন নারীরা।

গ্রামের সাধারণ মানুষ হাতের কাছে পাওয়া সহজ এমন উপকরণ দিয়ে শিল্পবস্তু তৈরি করে চলেছেন বংশপরম্পরায়। এ নিত্য ব্যবহার্য বস্তুটি বিশেষ করে মেয়েদের হাতে পরে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সুতা, সুতি কাপড়, বাঁশ, চুলের ফিতা, বেত, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, তালপাতা, সন, কলার শুকনো খোল, পাখির পালক, সুপারির খোল, শোলতা, কাঁশ, বিন্না ও গমের ডাঁটা চন্দন কাঠ মোটা কাগজ প্রভৃতি পাখার উপাদান। নকশা অনুসারে নকশি পাখার নাম পালংপোষ, সুজনে ফুল, বলদের চোখ, শঙ্খলতা, কাঞ্চন মালা, ছিটাফুল, তারাফুল, মনবিলাসী, মনবাহার, ময়ূরপঙ্খী বাগবন্দি, ষোলকড়ির ঘর, মন সুন্দরী লেখা, সাগর দিঘি, হাতি, ফুল ও মানুষ (ওয়াকিল আহমেদ, ১৯৭৪ : ৫২)। সুতা বাঁশ সরতা বেত ও কলার খোলের শুকনো বেতি দিয়ে পাখা বোনা হয় পাটি বা মেদ বোনার কায়দায়। কিউবিজমের কায়দায় জ্যামিতিক নকশায় বিভিন্ন মোটিফের রূপদান করা হয়। মোটিফ বা ডিজাইনের বিভিন্ন নামও রয়েছে। এর মধ্যে পান গুছি, তারাজো, কেচিকাটা, পুকুইরাজো, ধানছড়ি, ফলং ঠেইঙ্গা বা ফড়িং-এর ঠেং, রাবন কোডা, নবকোডা, চা বাগানের বেড়া, কবুতর কোপ, মাকড়ের জাল, পদ্মাজো, ধাইড়া জো, কামরাঙ্গাজো, পাবনাইয়া জো, জিঞ্জিরা জো, নারায়ণগঞ্জ জো, সুজনীজো, চারতা ফুল, শঙ্খলতা ইত্যাদি (ওয়াকিল আহমেদ, ২০০৭ : ১৮২, ৮৩)।

তালপাতার নকশি পাখা :

তালপাতার পাখা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত করে একটি পরিপূর্ণ পাখা তৈরি করা হয়। তালপাতার পাখা চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চলে বেশি চোখে পড়ে। তালপাতা সংগ্রহ করে দা দিয়ে কেটে ডাঁটা থেকে পাতা ছাড়ানো হয় ফিতার আকৃতিতে। এখানে শিল্পীর কর্মদক্ষতার প্রয়োজন (ওয়াকিল আহমেদ, ২০১৭ : ১২৮)। পাতার ডাঁটা বা কাণ্ডের মধ্যে থাকে অসংখ্য আঁশ। ডাঁটাটিকে দু-একদিন ভিজিয়ে রাখলেই সুতার মতো লম্বা আঁশ বের হয়। এ আঁশটি পাখার চারদিকে বাধার কাজে লাগে। ডাঁটা থেকে পাতার বেতি বের করে সমান দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আটি বেঁধে তা শুকিয়ে রং করতে হয়। ১টি পাতা থেকে প্রকারভেদে প্রায় ৪/৫টি পাখা তৈরি হয়। তালপাতার পাখার নকশায় লাল, নীল, সবুজ, হলুদ এবং পাতার স্বাভাবিক রং করা হয়। প্রাচীনকালে ভেষজ রং ব্যবহার হলেও বর্তমানে বাজারে পাওয়া কৃত্রিম পাওয়ার রং মিশিয়ে সিদ্ধ করে বেতি রং করা হয়। ফ্রেমের ফাঁকে রঙের ভিন্নতার জন্য কন্ট্রাস্ট রঙের বেতি ঢুকিয়ে বুনতে হয়। শলার পিছনের ফাঁকে বেতি আটকিয়ে সুইয়ের সেলাইয়ের মতো বেতি ঢোকানো হয়। নকশার প্রকারভেদে বেতিকে চারদিক থেকে বিভিন্ন রং এ ছকে স্থাপন করা হয়। সম্পূর্ণ বোনা হয়ে যাওয়ার পর চারদিকে শিরদাঁড়াসহ তালপাতা দিয়ে মুড়ে ডাঁটার আঁশ দিয়ে সেলাই করা হয়। প্রাথমিক ছক থেকে বুননের শেষ পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় নকশা মোটিফ তৈরি হয়। মোটিফের মধ্যে মৌচাক মোটিফটির স্থানীয় নাম তারাফুল। আরও আছে শাপলা ফুল, বুটি ফুল, হাজার বুটি, এক ডেইল্লা, দুই ডেইল্লা, পাঁচ ডেইল্লা এছাড়া নাম না জানা হাজার রকমের জ্যামিতিক ফর্ম (রবীন্দ্র গোপ, ২০১৪ : ২৩৫)। আবার আস্ত পাতাকে বৃত্তাকারে কেটে চারপাশে বাঁশের চিকন শলাকা দিয়ে বাঁধাই অথবা কাপড় দিয়ে মুড়ে চারপাশে সেলাই করে তালপাতার পাখা বানানোর প্রচলন আছে। এভাবে তৈরি তালপাতার পাখায় শ্রম কম ও আলাদা হাতল লাগানোর প্রয়োজন হয় না। পাতার ডাঁটায় হাতল হিসেবে কাজ করে।

(চিত্র-১ : তালপাতার ফোল্ডিং পাখা)

বাঁশের নকশি পাখা :

বাঁশের বেতি দ্বারা তৈরি নকশাযুক্ত পাখা নোয়াখালীর হাতিয়ায় এ পাখার প্রচলন রয়েছে। বাঁশের সরু চিকন বেতি আড়া ও খাড়াভাবে বসিয়ে এ পাখা তৈরি করা হয়। গাছের বেতি একটু পাতলা ও সরু হয়ে থাকে। ডালা, চালুন, ডোলায় যেরকম বেতি ব্যবহার হয় সেরকম বেতিই পাখা তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়। সবুজ, নীল, মিনা, লাল, বেগুনি নানা রকম রং করে বেতি চৌকোনা খোপ ছোট থেকে ক্রমশ বড় আকারে সূক্ষ্ম ডিজাইন করা হয়। জ্যামিতিক নকশা ছাড়াও কলমিফুল, গাছে হাতি ও ফুল, সূর্যমুখী, নানারকম বৃত্ত ও ফুলের নকশা আবার কবিতা বা শ্লোক ও নকশা করা হয়।

চিত্র-২ : বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি পাখা, প্রাপ্তিস্থান : হাতিয়া, নোয়াখালী।

কাপড়ের পাখা :

নকশি সুতার ও কাপড়ের পাখা চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, টাঙ্গাইল অঞ্চলে বোনা হয় বেশি, পাখার মোটিফের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও শিল্পীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, কাপড়ের পাখার নকশা শৈলীতে স্বাভাবিক সৃষ্টিশীলতা রয়েছে। সুতা দিয়ে ফুল তোলার পূর্বে আউট লাইন ড্রইং করে নিয়ে ফর্ম তৈরি করার জন্য কারুশিল্পী নিজেই কাজ করেন। এই পাখায় ফুল তোলার পূর্বে গোলাকৃতি ফ্রেম করে কাপড় মুড়ে নেয়া হয়। ফুল তোলার পরে চারদিকে লালশালুর ঝালর দিয়ে আর্কষণীয় করা হয়। কিছুটা রাজকীয় করার জন্য সুশোভিত হাতল বানানো হয়। হাতলের উপরে পেছন দিক ধনুকাকৃতি করা হয় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য।

সুতার নকশি পাখা :

সবচেয়ে বেশি শিল্পগুণসমৃদ্ধ নকশিপাখা সুতা দিয়ে বোনা গোলাকার পাখা। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে সুতার নকশি পাখা বেশি দেখা যায়। নানা ডিজাইন বিচিত্র রঙের সুতার পাখার জ্যামিতিক নকশা দিয়ে নানারকমের মটিফ ফুটিয়ে তুলা হয়। বাংলা অক্ষরে শ্লোক লেখা থাকে আবার কবিতার লাইন উৎকীর্ণও করা হয় এসব পাখায়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ফুল, লতা-পাতা, পাখি, হাতি ইত্যাদির ডিজাইন বেশি করা হয়। সেই সাথে পাখার পরিধির সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় রংবেরঙের ঝালর, সেলাই করে নকশা তোলা ছাড়াও বিভিন্ন রঙের সুতার সমন্বয়ে টানা দিয়ে চক্র পদ্ম, বিভিন্ন চৌক বা বিচিত্র ধরনের ডিজাইন করা হয়। ডিজাইনগুলো জ্যামিতিক ফর্মে ফুটিয়ে তোলা হয়। ডিজাইনে ভেদে নামে ভিন্নতা রয়েছে, যেমন–নবকোডা, শঙ্খলতা, শতফল, নিশান কাটা, সিঙ্গারা, হাঁটুভাঙ্গা 'দ' প্রভৃতি। কাপড়ের উপর উল ও সুতা দিয়ে সেলাই করেও সুদৃশ্য পাখা তৈরি হয়। পাখাকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে রেশম সুতা, জরির সুতা, ইত্যাদি ও ব্যবহৃত হয় কখনো কখনো। পাখার মাঝে মাঝে বসানো হয় গোল গোল ছোট বুটি।

(চিত্র-৩ : সুতার নকশি পাখা, প্রাপ্তিস্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ময়ূরের পাখনা দিয়েও নকশিপাখা তৈরি করা হয়। প্রাচীন কালে রাজা-বাদশারা এই পাখা ব্যবহার করতেন। ময়ূরের পালক দিয়ে তখন বৃহদাকার পাখা তৈরি করে বাতাস করা হতো। এখন ছোট আকারে ময়ূরের পালক দিয়ে শৌখিন নকশি পাখা তৈরি করা হয়। সিলেটে রুপার সুতা ও হাতির দাঁতের টুকরো দিয়ে অনবদ্য নকশি পাখা উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে দেখা গেছে জানা যায় (শাওন আকন্দ, ২০১৩ : ১৪৭)। চুলের ফিতা দিয়েও তৈরি করা হয় নকশি পাখা পুরোনো কিংবা নতুন ফিতা দুই-তিন ভাঁজ করে পাখায় মোটিফ তোলা হয় এর আঞ্চলিক নাম 'পুকুরিয়া জো'। দুই মাত্রার নকশা করা যায় এ পাখায়। প্রথম পর্যায় বিভিন্ন রঙের ফিতা দিয়ে চাটাইয়ের মতো বুনন প্রক্রিয়ায় নকশা করা হয়। ২য় পর্যায়ে একে জমিনরূপে ধরে তার উপর রঙিন ফিতা দিয়ে খোপ খোপ আকারে বোনা হয়। সুপারি গাছের আঁশ ও খোল থেকেও নকশি পাখা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে গাছ কেটে ভিজিয়ে রেখে আঁশ বের করে নেওয়া হয়। পরে সুত ও আঁশ রং করে গোলাকার পাখা তৈরি করা হয়।

বেতের নকশি পাখা :

বরিশালে বেত দিয়ে বিশেষ চারকোনাকার পাখা বোনা হয় যা অন্যান্য অঞ্চলের পাখা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যময়। স্বরূপকাঠি জেলায় এই পাখার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। পাখার উপকরণ বিচিত্র নকশা ও রং দেখেই আলাদা করে বুঝা যাবে যে এটি বরিশালের স্বরূপকাঠি অঞ্চলের পাখা।

এই পাখা তৈরির প্রধান উপকরণ মুর্তা নামক এক প্রকার গুল্মজাতীয় নল উদ্ভিদ। শীতলপাটির বেতও এই নল থেকে বেত তৈরি করে বোনা হয়। বরিশাল অঞ্চলের মানুষ এই গুল্মজাতীয় নলকে পাইত্রা বলে। পাইত্রার গাছ কেটে উপরের আবরণ সবুজ অংশ চেঁছে ফেলে দিতে হয়। তারপর পানিতে ভিজিয়ে রেখে ছাল আলাদা করে তা থেকে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বেতি বা বাতা বের করতে হয়। বেতি বের করে সিদ্ধ করে অথবা না সিদ্ধ করেও শুকানো হয়, পরে বেতি পানি দিয়ে ভিজিয়ে সারা বছর বুননের মাধ্যমে নকশি পাখা তৈরি করা হয়।

সাধারণত চৈত্র, বৈশাখ মাসে বেত গাছ কেটে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বেত প্রস্তুত করা হয। নারীরা বর্ষাকালে ঘরে বসে পাখা বোনার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। এই বেত দিয়ে শুধু পাখাই তৈরি করেন না তারা পাটি, চালুন, ডালা প্রভৃতিও বানিয়ে থাকেন।

বেত শুকানোর পর রং করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পূর্বে ভেষজ রং ব্যবহার হলেও বর্তমানে প্লাস্টিক পেইন্ট ব্যবহার করে পাখাশিল্পীরা। প্রথমে তিনটি বা পাঁচটি বেত নিয়ে আড়াআড়িভাবে নিয়ে কেন্দ্র থেকে বোনা শুরু হয়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে চারদিকে বুনে আট থেকে বারো বা ষোলো ইঞ্চি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, ছয় থেকে বারো ইঞ্চি পর্যন্ত প্রস্থ হয়ে থাকে। তারপর দৈর্ঘ্যের দিকে বাঁশের হাতলযুক্ত করে শক্তভাবে প্লাস্টিক বেত বা সুতা দিয়ে বাঁধা হয়। রং অনুসারে বেতগুলোকে সাজিয়ে জ্যামিতিক বা বিভিন্ন মৌটিফের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। লাল, নীল, কাল, সবুজ, হলুদ সবধরনের রঙের ব্যবহার হয়ে থাকে এই পাখায়। কখনো ঢেউয়ের ফর্ম আবার বকুল ফুল, চালতা ফুল, কাকইর ফুল, চতুর্ভুজের রিপিটেশন কিংবা সিঁড়ির মতো জ্যামিতিক ফর্ম লক্ষণীয়। এই পাখার বিশেষ দিকটি হচ্ছে এর একটি পাশে নকশা অপর পাশটি উল্টো দিক, যদিও নকশা দেখা যায় উভয় দিকেই কাপড়ের মতো উল্টো দিকও রয়েছে এ পাখায়। চারদিকে কোনো আলাদা কাপড়ের বর্ডার না থাকলেও বোনার ধরনে তা মিলিয়ে বোনা হয় ফলে চারধার সুন্দরভাবে মিলিয়ে সমান হয়ে কোনা তৈরি হয়। বৃত্তাকার করতে চাইলে চারকোনা পাখা কেটে গোলকার করে কাপড় দিয়ে সেলাই করা যায় তবে এর প্রচলন খুব কম।

(চিত্র-৪ : পাইত্রা বেতের পাখা, প্রাপ্তিস্থান : মাহমুদকাঠি, নেছারাবাদ, স্বরূপকাঠি, বরিশাল।)

ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে সমন্বয় করে যুগ যুগ ধরে বরিশালের হাতপাখার কারুশিল্পীরা পাখা তৈরি করছেন। সাধারণত নারীরা বংশপরম্পরায় এই পাখা বুনছেন এবং পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহ করছেন। অনেকের সংসার চলে পাখা তৈরি করে।

নকশি হাতপাখার বাণিজ্যিক দিক ও সম্ভাবনা : বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলনের কারণে হাতপাখার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমে গিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে বর্তমানে গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। তবে হাতপাখার ব্যবহার একবারে শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের দেশে আবহাওয়ার প্রয়োজনেই হাতপাখার ব্যবহার বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু লোকশিল্প ও কারুশিল্পীদের জীবনমান খুব ভালো নয় তারা সামান্যই আয় করে থাকেন এই শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কারণে।

নকশিপাখা সেলাইয়ের শিল্পী গ্রামের মেয়েরা। গ্রামের মেয়েদের তৈরি বস্তু, জিনিস নকশিপাখা প্রয়োজনের এক শিল্প। অন্যান্য কারুশিল্পের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নকশিপাখার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল না। কারণ নকশিপাখা ব্যবসায়ীক কেনাবেচায় প্রাচীনকাল থেকে এমনকি ৭০-এর দশক পর্যন্ত প্রবেশ করেনি। অন্তঃপুরের নারী তার কাজের অবসরে বিশেষ করে বর্ষাকালে একান্তই নিজ সংসারে শিশু, প্রিয়জনের বা

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য নকশিপাখা তৈরি করত। ফলে গ্রামীণ লোকজীবনে, লোকমেলায়, হাটে, বাজারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে নকশিপাখা কখনো কেনাবেচা হয়নি। কেবল পরিবারের প্রয়োজনেই নারীরা নকশিপাখা তৈরি করেছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে নারী পরিবারের সদস্যদের জন্য পাখা তৈরি করলেও প্রতিটি পাখা কিন্তু নকশিপাখায় পরিণত করেনি। অতি আপন মর্যাদায়, ভালোবাসার, স্নেহের জনকে নারী হৃদয়ের সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিকে উজার করে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে নকশিপাখাকে বেছে নিয়েছিল। এজন্যই নকশিপাখায় কখনো কখনো শিল্পী যাকে নকশিপাখা উপহার দেন তার নাম রঙিন সুতায় লেখেন। এছাড়া নকশিপাখা ভালোবাসার, মর্যাদার, স্নেহের উপহারের বস্তু হিসেবে বাংলার সমাজে প্রতিষ্ঠিত। নকশিপাখা বাংলাদেশের অন্যান্য কারুশিল্পের মতো কুটিরশিল্প পর্যায়েও কখনো বিস্তার লাভ করেনি। নকশিপাখা বাংলার নারীর শিল্পবোধ ও চেতনার ফসল। বোধকরি একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নকশিপাখা আমাদের লোকসমাজের নারীদের অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি, প্রতিটি নকশিপাখা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের, শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির ও চেতনার।

নকশিপাখায় লোকজীবন ধারার বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক উপাদান-নারীর সৌন্দর্য অনুভূতি ও শিল্পবোধই অধিক ক্রিয়াশীল। ফলে নকশিপাখা ব্যবসায়ীক পণ্য হিসেবে বাংলার লোকসমাজে কখনো চিহ্নিত হয়নি। নকশিপাখা ছিল একান্তই অন্তঃপুরের, নকশিপাখা তৈরির উপকরণের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের প্রচলিত কৌশল এই লোক-কারুশিল্পটিকে ব্যবসায়ীক থেকে দূরে রেখেছিল। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাও কমে গেছে, ফলে শিল্পীদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বংশপরম্পরায় গড়ে উঠা এই কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হারিয়ে যাচ্ছে. নকশিপাখার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। শিল্পীদের টিকিয়ে রাখার জন্য নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

বরিশালের স্বরূপকাঠির নেছারাবাদ থানার মাহামুদকাঠি অঞ্চলের আছিয়া বেগম বয়স ষাটোর্ধ্ব তিনি জানান তারা পারিবারিকভাবে হাতপাখা বানাচ্ছেন ছোটবেলা থেকেই। পাখা তৈরির মাধ্যমে তার সংসার চলে, আয় হয় খুব সামান্যই, তার দু সন্তান আছে, স্বামী নেই। তার কাছ থেকেই তার মেয়ে মুর্শিদা ও পাখা বানানোর পেশায় নিয়োজিত আছেন। একটি পাখা নকশা বেঁধে ৩০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করে থাকেন। এসব পাখা গ্রামের হাটে বিক্রি করা হয় আবার বাড়ি থেকেও খুচরাভাবে

আশপাশের ক্রেতা সাধারণ নিয়ে থাকেন। এই নকশিপাখার নকশা ও স্থায়িত্ব ধরে রাখার জন্য শিল্পীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পাইকারিভাবে বাজারজাত করা হলে শিল্পীরা যেমন–স্বাবলম্বী হবে পাখার গুনগত মান ও বৃদ্ধি পাবে। নকশিপাখার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগে গ্রহণ করা যেতে পারে :

১। পাখা বুননের ক্ষেত্রে যারা বেশি কর্মদক্ষ তাদেরকে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও সংস্থার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে গ্রামের নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ফলে পুরোনো লোকশিল্পী ও নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান অথবা আয়ের উৎস তৈরি হবে এবং তারা স্বাবলম্বী হবে।

২। বিভাগীয় শহর ও রাজধানীতে তাদের পণ্য সরবরাহের বাজার জাত ও বিপণনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা প্রয়োজন।

৩। লোকশিল্পীরা যেন তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান সেজন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে পাশাপাশি সরাসরি পাখাশিল্পীদের পাখা শহরে যেন নিজেরা বিক্রি করতে পারেন এ উদ্দেশ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনে তাদের যোগাযোগ সহজতর করা যেতে পারে।

৪। হাতপাখা একটি প্রাচীন ঐতিহ্য, একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ, এই পাখা তৈরির কাজটি যে একটি সম্মানজনক পেশা এ বিষয়ে পাখা তৈরি শিল্পীদেরকে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ধারণা দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত থেকে পাখা তৈরির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ ঐতিহ্য সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ফাউন্ডেশন করছে।

৫। শিল্পীরা প্লাস্টিক পেইন্ট ব্যবহার করে থাকেন অথচ এক সময় প্রাকৃতিক ভেষজ রং ব্যবহার করত শিল্পীরা যার গুণগত মান অপরিসীম। শিল্পীদের সচেতন করে পূর্বের রং প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

লোক ও কারুশিল্পের বিশেষজ্ঞ ও অনুরাগীরা প্রায়শই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে থাকেন এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু শতাব্দীর পরিক্রমায় পুরুষানুক্রমে শুধু মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত

যে দক্ষ ও নিপুণ সৃষ্টি কৌশলের মাধ্যমে এবং জাতীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট গৌরবময় ঐতিহ্য আজও দেশে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সকল মহলের এখন থেকেই কাজ করে যেতে হবে।

শহরে বিলাস শিল্পের মোহ ছেড়ে বাংলার পল্লির বিশেষ করে নারীদের শিল্পকলা কৌশলের বিকাশ এক সময় ছিল যা এখন কমে যাচ্ছে তা পুনরায় ফিরিয়ে আনা দরকার। বাংলার গ্রামের এই সহজ সরল, প্রাণবান ও শক্তিশালী পাখাশিল্প আমাদের আধুনিক নাগরিক শিল্পের বিলাসিতা ও চাকচিক্যময় প্রণালির থেকে অনেক উন্নতমানের এবং বিশুদ্ধ লোকশিল্প। ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখেই আমরা পাখাশিল্পের সংরক্ষণ উন্নয়ন ও বিপণন করতে পারি। এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই। যার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে লোকশিল্প গবেষক ও লোকশিল্পের সংগ্রাহক ও ফাউন্ডেশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। বাংলার লোকশিল্প যুগে যুগে সব সময় সব শিল্পের অফুরন্ত আধার ও উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতের শিল্পীদেরও এই উৎসের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

পাখাশিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিল্পীদের সহায়তায় গঠিত একটি বিশেষ সেল গঠন অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বর্তমান করোনা মহামারি ও তার পরবর্তী সময়ে কীভাবে হাতপাখা শিল্পীদের প্রণোদনা প্রদান করা যায় ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের পেশায় টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক সহায়তার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে; তবেই হাতপাখা শিল্প টিকে থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১। সম্পাদক : লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা,
প্রকাশক : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

২। সম্পাদক : ওয়াকিল আহমদ, ফোকলোর, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

৩। ওয়াকিল আহমদ, বাংলার চারু ও কারুকলা লোকশিল্প, গতিধারা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

৪। রফিকুল আলম, উপমহাদেশের শিল্পকলা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৫। মোস্তফা তারিকুল আহসান, বাংলাদেশের ফোকলোর তত্ত্ব ও অধ্যয়ন, ঘরোয়া বুক কর্নার, ফেব্রুয়ারি ২০২০।

৬। শাওন আকন্দ, বাংলাদেশের লোকশিল্পের রূপরেখা, জার্নিম্যান-জলরং যৌথ প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৭। এবনে গোলাম সামাদ, মানুষ ও তার শিল্পকলা, ম্যাগনাম ওপাস, জুন ২০০৬।

৮। সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ, বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্ম, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, জুন ২০১৪।

৯। সম্পাদক : দুলাল চৌধুরী, পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ পুস্তক বিপণি, ২০১৩।

১০। ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, অক্টোবর ১৯৭৪।

১১। সাক্ষাৎকার : বরিশাল অঞ্চলের নারী পাখাশিল্পী।